নারী প্রগতির প্রতীক: শ্রীমা সারদা দেবী

সুমনা চন্দ
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ,
দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়
E-mail: csumana1993@gmail.com

সারসংক্ষেপ

যুগ বদলায়, সেই বদলের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের চেহারারও বদল ঘটে। পুরোনো যুগের রীতিনীতি, আচার-আচরণ আঁকড়ে না ধরে নতুন চিন্তার কাছে আত্মসমর্পণ করাই মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। তাই আধুনিক নারীজাতি পুরুষ-শাসিত যুগের নির্ধারিত প্রথাগত কর্মের গণ্ডি থেকে মুক্ত হতে চেয়েছে। তারা চেয়েছে অধ্যাপনা, চিকিৎসা, ব্যাবসা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, রাজনীতি সবক্ষেত্রেই পুরুষদের সমান স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা লাভ করতে। আসলে এর মূলে রয়েছে— নারীজাতির মধ্যে বিরাজমান যে বিশেষ শক্তি এবং কল্যাণমূলক অন্তর্দৃষ্টি, তাকে সমস্ত কাজে প্রয়োগ করার চিন্তা। এর ফলস্বরূপ গড়ে উঠেছে নারীমুক্তি আন্দোলন। এ প্রসঙ্গে আমি আলোকপাত করার চেষ্টা করব যে, মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার প্রেক্ষাপটে আবির্ভূতা নারীশক্তির প্রতিমূর্তি শ্রী শ্রী মা সারদাদেবীর জীবন দর্শন কীভাবে আধুনিক নারী জীবনের আদর্শ হয়ে উঠতে পারে। কীভাবেই বা সারদা মায়ের জীবন পথকে পাথেয় করে নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ''নারী চেতনার উন্নয়ন'' (Consciousness raising) সম্ভব হতে পরে।

সূচক শব্দ :

নারীশক্তি, লোকমাতা, শ্রীমা, শক্তিরূপিণী, সঙ্ঘজননী

নারী প্রগতির প্রতীক: শ্রীমা সারদা দেবী

মানুষ যখনই সংকটের সম্মুখীন হয়েছে তখনই তার থেকে মুক্তির আশায় সে স্মরণ করেছে তার ইষ্ট দেবতাকে, যিনি তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে মানুষকে সংকট মুক্ত করতে পারেন। সেই পরিত্রাতা যুগে যুগে নানা রূপে 'অবতার' নামে আবির্ভূত হয়েছেন। ঈশ্বরের এমনই এক রূপের প্রকাশ ঘটেছিল ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের মধ্য দিয়ে। আর এই যুগাবতারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর শক্তি স্বরূপ আবির্ভূত হয়েছিলেন যিনি, তিনি আর কেউ নন— শ্রী শ্রী সারদা মা। ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর শক্তির (মা সারদার) বন্ধন অবিচ্ছেদ্য, তাই তো তাঁরা পরস্পর জীবনসঙ্গী রূপে নির্বাচিত। মায়ের স্বরূপের পরিচয় আমরা ঠাকুরের বক্তব্যের মধ্যেই পাই। তিনি বলতেন : 'ও আমার শক্তি।'[১] তবে মায়ের শক্তিরূপের নিদর্শন তাঁর সমগ্র জীবনখানি। শক্তির প্রকাশ সর্বদা বাহ্যিক নয়, তার প্রকাশ অন্তরালেও হয়ে থাকে। তাই এই নারীর আবির্ভাব হয়েছিল সঙ্গোপনে,

অবগুণ্ঠিতা হয়ে। কোনও গ্রন্থরচনা, জনসমক্ষে বক্তৃতা প্রদান, পাহাড় পর্বতে তপস্যা করা— এসবে কোনোটিতেই তিনি নিজেকে যুক্ত করেননি। বরং নিজেকে যুক্ত করেছিলেন সংসারের মধ্যেই। ঠাকুর যেখানে ছিলেন আত্মভোলা, সেখানে মা ছিলেন ঘোর সংসারী; আত্মীয় স্বজনের সুখে দুঃখে চিন্তিত, নিষ্ঠাবতী, পতিব্রতা এবং সংসারী রমণী। কিন্তু তাঁর এই অন্তরালবর্তী জীবন কোন মহান্ জীবনের আদর্শ জগতের কাছে রেখে গিয়েছিল? এ প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের দেখতে হবে মায়ের সহজ আবরণে আবৃত জীবনটির দিকে, যার প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে যেমন সত্যের, মানবিকতার, উদারতার, অধ্যাত্মপথের শিক্ষা, তেমনই রয়েছে ধৈর্য্যের, সহ্যের, ত্যাগের এবং ভালবাসার শিক্ষা। যাঁর সমগ্র জীবনই একটি শিক্ষা গ্রন্থ, তাঁর গুণ-বর্ণনা আমার এই সীমিত লেখার মধ্যে আবদ্ধ করার সাধ্যই বা কতটুকু? সেই চেষ্টা কী মহাসমুদ্রকে একটি ঘটের মধ্যে ধরার চেষ্টার মতোই হবে না? তবু সাধ্য না থাকলেও এই আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। মাতৃনাম যেভাবেই জপ করা হোক না কেন, তা অবশ্যই আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। মায়ের জীবন আলোতে বর্তমান নারী সমাজকে প্রতিফলিত করার ক্ষেত্রে প্রথমে শ্রী শ্রী মায়ের মহান জীবনের কয়েকটি দিক আমি উল্লেখ করার চেষ্টা করবো। তার থেকেও আমাদের যদি এতটুকু শুভচিন্তা আসে তবে তাও হবে পরম প্রাপ্তি।

মা সারদার স্বরূপ যদি কেউ সম্পূর্ণভাবে জেনে থাকেন, তিনি একমাত্র ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। মায়ের সেই রূপের যতটুকু প্রকাশ তিনি করেছেন তা না করলে হয়তো মা চিরকালের জন্য অন্তঃসলিলা হয়েই থাকতেন। মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ বলেছেন : 'কি সাধারণভাবে তিনি থাকতেন! আমরা তাঁকে কি বুঝব? একমাত্র ঠাকুরই মাকে ঠিক ঠিক বুঝেছিলেন।'[২] সারদাদেবী সম্পর্কে ঠাকুরের অকপট স্বীকারোক্তি : 'ও (শ্রীমা) সারদা - সরস্বতী - জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।'[৩] তাঁর এই বক্তব্য থেকে বোঝাই যায়, ঠাকুর মাকে শক্তিরূপেই গ্রহণ করেছিলেন। আরও লক্ষণীয় যে রামকৃষ্ণদেব সারদা মাকে তাঁর নিজের চেয়েও উঁচু আসনে স্থাপন করেছিলেন। কারণ ঠাকুর জানতেন, যে প্রয়োজন সাধনের জন্য তাঁর আবির্ভাব, তাঁর শক্তিরূপিণী সারদাদেবীর ভূমিকা তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়, বরং বেশী। মায়ের ওপর তাঁর এই বিশ্বাসের পরিচয় নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায়। একবার একজন মহিলা সাধক (তিনি হলেন কালীপদ ঘোষের অর্থাৎ দানাকালীর স্ত্রী) স্বামীর মঙ্গলের জন্য দৈব ওষুধ চেয়ে ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন। রামকৃষ্ণদেব সব শুনে মহিলাটিকে বললেন, 'সেখানে (নহবতে) এক স্ত্রীলোক আছেন; তাঁকে তুমি সব খুলে বললে তিনি ঠিক ঠিক ওষুধ দেবেন। এবিষয়ে তাঁর শক্তি আমার চেয়ে বেশী।' রামকৃষ্ণদেব রহস্য করে শ্রীমাকে বলতেন 'ছাইচাপা বেড়াল।'[৪]

যে কোন মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নারীশক্তির প্রয়োজন যে কতখানি, এই সকল ঘটনাই তার পরিচয়, এবং সেই শক্তিকে ঠিক কতখানি মর্যাদা এবং সম্মান দেওয়া যায়, শ্রীমায়ের জীবন বৃত্তান্তে তার অগণিত দৃষ্টান্ত আমরা পাই। সেখানে জানা যায়, ঠাকুর কখনও মাকে 'তুই' পর্যন্ত বলেননি এবং অজান্তে কখনও বলে ফেললেও তার জন্য তাঁর অনুতাপের শেষ থাকত না। বলে রাখা ভাল যে, সেই সময়ে গ্রামাঞ্চলে বহু পরিবারে পুরুষরা স্ত্রীকে 'তুই' বলতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং এই বিষয়টিকে খুব একটা অস্বাভাবিক

বলে মনে করা হত না। শুধু মর্যাদাই নয়, শ্রী শ্রী মায়ের প্রতি ঠাকুরের আচরণে প্রকাশ পেত এতখানি সম্ভ্রম যে, মা তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দেওয়ার পর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার তাঁকে নমস্কার করতেন।[৫] মা যে শক্তিরূপিণী সেই বিষয়ে ঠাকুর নিজে যেমন অবগত ছিলেন, তেমনি অন্যদেরও সে সম্পর্কে বারবার সংযত করতেন। শ্রীমায়ের প্রতি হৃদয়ের (রামকৃষ্ণদেবের ভাগ্নে) দুর্ব্যবহার দেখে একদিন তাকে সাবধান করে বলেছিলেন : 'ওরে হৃদে, (নিজেকে দেখিয়ে) একে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলিস বলে ওকে (শ্রীমাকে) আর কখনও এমন কথা বলিসনি। এর ভেতর যে আছে, সে ফোঁস করলে হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে পারিস; কিন্তু ওর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে তোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবেন না।'[৬]

অবতার রূপে যাঁরা পৃথিবীতে আসেন তাঁদের রূপ ক্রমে ক্রমেই সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়। ঠাকুর মায়ের স্বরূপ সম্পর্কে প্রথম থেকেই সচেতন হলেও তাঁর সন্তানেরা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন না। আসলে অন্তরালবর্তিনী শ্রীমায়ের অসাধারণত্বের বাহ্যিক প্রকাশ সেভাবে ছিল না। তাঁর সহজ-সাধারণ জীবনচর্যার মধ্যেই যেন অসাধারণ মহিমা সুপ্তাবস্থায় সর্বদাই বিরাজমান। সেই মহিমা, সেই অসাধারণত্বের অল্প-বিস্তর পরিচয় পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল রামকৃষ্ণ ও মায়ের বেশ কয়েকজন ত্যাগী শিষ্যদের। মায়ের স্পর্শে তাঁরাও হয়ে উঠেছিলেন ত্যাগীভক্ত, মহাপুরুষ। মায়ের সঙ্গে নিজেদের নানা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তাঁরা শ্রীমাকে আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন—

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের গভীরতায় শ্রীমা ঠিক কোন্ স্থানে বিরাজ করতেন তা হয়তো আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তবে শ্রী শ্রী মায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নানা ঘটনার মাধ্যমে উল্লেখ করলে তা আমাদের মাতৃবন্দনার পরম সহায়ক হবে।

মা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম উক্তি পাওয়া যায় বলরাম বসুকে (রামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ গৃহী পার্ষদ) লেখা একটি চিঠিতে। সেখানে স্বামীজী লিখছেন : 'গিরিশবাবুর সহিত মাতাঠাকুরানীকে (কলিকাতায়) আনিবার জন্য কি মতান্তর হইয়াছে, গিরিশবাবু লিখিয়াছেন— সে বিষয়ে আমার বলিবার কিছু নেই। .....মাতা ঠাকুরানীর যে প্রকার ইচ্ছা হইবে, সেই প্রকারই করিবেন। আমি কোন্ নরাধম, তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিষয়ে কথা কহি?'[৭] স্বামীজী নিজেকে কেবল রামকৃষ্ণদেবের নয়, শ্রী শ্রী মায়েরও 'জন্মজন্মান্তরের দাস' বলতেন। এই কারণে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি লেখককে নির্দেশ দেন ঠাকুরের সঙ্গে মায়ের স্তব অন্তর্ভুক্ত করার জন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা সম্পর্কে প্রথমদিকে স্বামীজীর মনে কৌতূহল ও প্রশ্ন থাকলেও মায়ের মহিমা সম্বন্ধে কোন কালেই তাঁর কোনও সংশয় ছিল না। স্বামীজী শ্রী শ্রী মাকে এক বৃহৎ সম্ভাষণে ভূষিত করেছিলেন— 'জ্যান্ত দুর্গা'। মা দুর্গার মতোই শ্রীমায়েরও শান্ত-স্নিগ্ধ রূপের আড়ালে যে ভয়ঙ্কর বজ্র লুকিয়ে আছে তার কথা স্মরণ করেই হয়তো স্বামীজী মাকে 'জ্যান্ত দুর্গা' বলেছেন। যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্বামী বিবেকানন্দ 'ভগবানের বাবা' বলে সম্বোধন করেছিলেন, তাঁর ওপরেও তিনি শ্রীমাকে স্থান দিতেন। মা সম্পর্কে স্বামীজীর

এই পক্ষপাতিত্ব তিনি কখনই গোপন করতে চাইতেন না, বরং তা জোর গলায় স্বীকার করেই তিনি যেন পরম তৃপ্তিলাভ করতেন। এই অকপট স্বীকারোক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় স্বামী শিবানন্দকে লেখা স্বামীজীর একটি চিঠিতে। তিনি লিখছেন : 'দাদা রাগ কোরো না, তোমরা এখনো কেউ মাকে বোঝোনি, মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড়। ..... ঐ মায়ের দিকে আমিও একটু গোঁড়া। মার হুকুম হলেই বীরভদ্র ভূতপ্রেত সব করতে পারে। ..... দাদা, এই দারুণ শীতে গাঁয়ে গাঁয়ে লেকচার করে লড়াই করে টাকা যোগাড় করছি - মায়ের মঠ হবে।'[৮] মনে প্রশ্ন উঠে, শ্রী মায়ের সম্পর্কে স্বামীজীর এই পক্ষপাতিত্বের কারণ কী? কোন্ আলোকে মা স্বামীজীর জীবনপদ্মে উদ্ভাসিত হয়েছিলেন যার জন্য মায়ের সম্পর্কে তাঁর এই গোঁড়ামি? - এর উত্তর আমরা পাই স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের লেখা থেকে। গুরুদেবের (শ্রীরামকৃষ্ণ) মৃত্যুর পর তাঁর বাণী ও শিক্ষাকে প্রচার করার দায়িত্ব এসে পড়েছিল স্বামী বিবেকানন্দ সহ কয়েকজন তরুণের ওপর। কিন্তু তাঁরা যে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শকে নিজেদের ও অপরের জীবনে প্রয়োগ করার সংকল্প নিয়েছেন - একথা সকলের কাছে উপহাসের মনে হয়। শুধু তাই নয়, তাঁদের ওপর রীতিমতো চলল অত্যাচার। এরকম সময়ে তাঁদের সম্বল হলেন শ্রীমা। অর্থদানের সামর্থ্য না থাকলেও মায়ের সহানুভূতি, আশীর্বাদ ও হৃদয় উজাড় করা ভালবাসার মধ্যে এমন এক শক্তি ছিল, যা না থাকলে সেই সময় কয়েকটি অল্পবয়স্ক নিঃসহায় তরুণের পক্ষে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সূত্রপাত করাই সম্ভব হত না। মায়ের প্রেরণাতে উদ্বুদ্ধ হয়েই ভারতের এক অভিনব আন্দোলন শুরু হয়েছিল, যার নায়ক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী প্রচারে একটা স্থায়ী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মা তাঁর স্নেহময়ী কণ্ঠে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন : 'তার জন্যে তুমি কোনো ভাবনা কোরো না। তুমি যা করেছো আর যা করবে তা চিরকাল টিকে থাকবে। এই কাজের জন্যই তোমার জন্ম। জগতের মানুষ তোমাকে লোকগুরু হিসাবে মানবে। তুমি নিশ্চিত জেনো, ঠাকুর তোমার আকাঙ্ক্ষা অচিরে পূর্ণ করবেন। অল্পদিনের মধ্যে দেখতে পাবে তোমার চিন্তা, তোমার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিচ্ছে।'[৯] মায়ের পরোক্ষ প্রভাব ও স্নেহের আকর্ষণের ফলশ্রুতি হিসাবে একসময় সেই সঙ্ঘের জন্ম হয়। তাই স্বামীজী মাকে সঙ্ঘজননী ও ধাত্রীজননী বলে মানতেন।

নারীশক্তির সার্থক উদ্বোধনের ওপরেই সমাজ, দেশ এবং জাতির সমৃদ্ধি নির্ভর করে বলে স্বামীজী বিশ্বাস করতেন। সেই কারণে সমাজকল্যাণের জন্য নারীর ভূমিকা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু যুগ যুগ ধরে সেই শক্তি অবহেলিত ও উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। ভারতের দুরবস্থার এটি অন্যতম প্রধান কারণ বলে স্বামীজী মনে করতেন। তিনি বলতেন : 'আমাদের দেশ সকলের অধম কেন? শক্তিহীন কেন? শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন। তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।'[১০] সমগ্র পৃথিবীর ভবিষ্যৎ স্থায়িত্বের জন্য স্বামীজীর যে আন্দোলন তাতে তিনি বিদেশিনীদের (মার্গারেট নোবেল, মিস ম্যাক্লাউড, মিসেস ওলিবুল) প্রয়োজনীতাও অনুভব করেছিলেন। কিন্তু ভারতে আগত এই সকল নারীদের তখনকার রক্ষণশীল সমাজ 'ম্লেচ্ছ' তকমা দিলেও স্বামীজী সবিস্ময়ে দেখলেন যে, শ্রীমা তাঁর বিদেশী সন্তানদেরও পরম আদরে ও স্নেহে নিজের কাছে টেনে নিচ্ছেন এবং একই সঙ্গে খাবার গ্রহণ করছেন। স্বামীজী বুঝলেন, এই অতুলনীয়ার তুলনা তিনি (মা) নিজেই। স্বামীজীর দৃষ্টিতে মায়ের স্বরূপ কীভাবে ধরা পড়েছিল তার সঠিক বর্ণনা করা হয়ত এককথায় সম্ভব

নয়। তবু বলা যায়, তাঁর কাছে মা কেবল গুরুপত্নী নন, কেবল সঙ্ঘজননী নন, তিনি ছিলেন বিশ্বজননী, যাঁর জীবনচর্যা কেবল ভারতে নারীর বন্ধনমুক্তির চেষ্টাকেই প্রেরণা যোগাবে না; সমগ্র পৃথিবীর নারী জাতিকে আন্দোলিত করবে।

ভগিনী নিবেদিতা

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের মূল ব্রত ছিল, নারী ও জনগণ উভয়েরই উন্নয়ন। সেই ব্রত পালনের দীক্ষায় তিনি দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন এক নারীকেই। তিনি হলেন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল - ভারতবর্ষের 'ভগিনী নিবেদিতা'। নারী শিক্ষার কাজে নিজেকে নিবেদন করতেই মূলত নিবেদিতার ভারতবর্ষে আগমন ঘটেছিল। তবে তার জন্য ভারতীয় নারীকে, ভারতীয় নারীর আদর্শকে জানা প্রয়োজন। এর জন্য স্বামীজী নিবেদিতাকে সমর্পণ করেছিলেন নারী আদর্শের পরাকাষ্ঠা এক মাতৃমূর্তির পদতলে—তিনি জননী সারদা দেবী। নিবেদিতার প্রথম মাতৃদর্শন হয়েছিল ১৭ই মার্চ, ১৮৯৮। দিনটিকে নিবেদিতা বলেছেন 'Day of Days'। মায়ের পাদপদ্মে ছিলেন ১৩ বছরেরও বেশী সময়। কিন্তু আয়ারল্যান্ড থেকে আগত এই নারী, যিনি ছিলেন জগৎ আলোড়নকারী শক্তির অধিকারী, এক ধাবমান অগ্নি; তিনি এই কয়েক বছরে কী পেয়েছিলেন লৌকিক অর্থে অশিক্ষিতা, পর্দাবৃতা, বহির্জীবন থেকে বিচ্ছিন্না সারদা দেবীর কাছে - যার জন্য মা সম্পর্কে নিবেদিতাকে বলতে হয়েছিল, 'আমার ধারণায় বর্তমান পৃথিবীর মহত্তমা নারী।'[১১] এর উত্তর পাওয়া যায় নিবেদিতার সঙ্গে মায়ের কাটানো সময়ের বেশ কিছু ঘটনার মধ্যে দিয়ে। নিবেদিতা সমগ্র ভারতবাসীর কাছে এক সময় 'লোকমাতা' হয়ে উঠলেও মায়ের কাছে তিনি চিরকাল ছিলেন তাঁর আদরের 'খুকি'। আর মা ছিলেন নিবেদিতার কাছে 'Holy Mother' বা 'মাতাদেবী'। স্বামীজীর ইচ্ছাতে নিবেদিতার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বাগবাজারের বালিকা বিদ্যালয়টিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বয়ং মা সারদাদেবী। তিনি বলেছিলেন : 'আমি প্রার্থনা করছি, যেন এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয় এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে।'[১২] নিবেদিতা তাঁর লেখাতে বলেছিলেন, মায়ের আশীর্বাদই ভবিষ্যতের শিক্ষিত নারীজাতির জন্য পরম প্রাপ্তি। ভগিনী নিবেদিতার মতো তেজস্বিনী রমণীকে মায়ের পাদপদ্মে যেন পাঁচ বছরের এক ছোট্ট মেয়ের মতোই মনে হতো। মা নিবেদিতাকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। বলতেন, 'আমার প্রাণের সরস্বতী'।

ভগিনী নিবেদিতা তাঁর লেখায় একটি প্রশ্ন করেছেন - সারদা দেবী কি প্রাচীন আদর্শের শেষ কথা, নাকি নূতন আদর্শের প্রথম প্রকাশ? এই দুটি বক্তব্যই যে মায়ের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য তা অবশ্য নিবেদিতা নিজের লেখায় বুঝিয়েছেন একাধিকবার। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো বাণীর ঐশ্বর্য সারদাদেবীর ছিল না। কিন্তু একথা কখনই মিথ্যে নয় যে, সবকিছুর মধ্যে আত্মবিস্তারের ক্ষমতা তাঁর ছিল, তাছাড়াও ছিল সাংসারিক ও ধর্মসংস্কৃতির এক বিরাট মহিমা। রক্ষণশীলতার আবরণে আবৃত ভারতবর্ষের এক রক্ষণশীল বিধবা হয়েও ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান মহিলাদের সাথে মা একই সঙ্গে একই পাত্রে খাবার খেয়েছিলেন। বহু বছর ধরে ভারতীয় নারীর কুসংস্কার, অশিক্ষার পরিচয় পেয়ে-আসা সেইসব পাশ্চাত্য নারীদের ভ্রান্ত ধারণার অন্ধকার এক লহমায় দূর হয়ে গেল মায়ের উদারতা, স্নেহ এবং দৃঢ় বুদ্ধি-বিবেচনার আলোতে।

নিবেদিতা প্রতিদিনের নানা ছোট-বড়ো ঘটনায় মায়ের সেই বিচার-বিবেচনার পরিচয় পেয়েছেন। তেমনি একটি ঘটনা - স্বামীজীর অদ্বৈত আশ্রমের নিয়ম লঙ্ঘন করে তাঁর দু-একজন শিষ্য আশ্রমে রামকৃষ্ণদেবের পটপূজা করায় স্বামীজী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন, এবং তাঁর ইচ্ছার সম্মানে পটপূজা বন্ধও হয়ে যায়। কিন্তু শিষ্যরা এতে মন থেকে সন্তুষ্ট হননি, তাই স্বামীজীর এই ইচ্ছার যৌক্তিকতার প্রশ্ন তুলে মাকে চিঠি লিখেছিলেন। মা উত্তরে বলেছিলেন : 'আমাদের গুরু যিনি, তিনি তো অদ্বৈত। তোমরা সেই গুরুর শিষ্য, তখন তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী।' তাঁর এই বক্তব্য শিষ্যদের সব প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য যথেষ্ট ছিল।

সবশেষে বলতে হয়, নিবেদিতার চোখে মা যেন ক্রমে মাতা মেরী হয়ে উঠেছিলেন। বস্টনের এক গির্জায় প্রার্থনা থেকে ফিরে এসে তাই তিনি ডাইরীতে লিখলেন : 'গির্জায় গিয়েছিলাম, সারদাদেবীকে আমার মেরী মাতা বলিয়া মনে হইল।' ধর্মসংস্কৃতিতে স্বীকৃত মাতৃরূপের মধ্যেই মা সারদার যে অমোঘ উপস্থিতি নিবেদিতার এই বক্তব্যই তার প্রমাণ।

স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ

স্কুলে ক্লাস এইটে পড়াকালীন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দের প্রথম মাতৃদর্শন হয়। তিনি বলেছেন : 'আমার কল্পনায় মা বিরাজ করেছিলেন এইভাবে - তিনি বসে আছেন একটি সুন্দর সাজানো সিংহাসনে, দুপাশে সেবিকারা চামর দোলাচ্ছে। কিন্তু দেখলাম, তিনি থাকেন ছোট মাটির দেওয়াল দেওয়া খড়ের চালাওয়ালা ঘরে। আরও দেখলাম, তিনি নিজ হাতে ঝাঁটা দিয়ে উঠোন পরিষ্কার করছেন।'[১৪] শ্রীমা সকল পুরুষদের সামনেই ঘোমটা দিতেন এবং ছিলেন খুবই মৃদুভাষী, যদিও তাঁর কাছে সকলেই ছিল তাঁর 'ছেলে'। আর ছেলের মনের কথা 'মা' ছাড়া আর কেই বা বুঝতে পারে? এ প্রসঙ্গে স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ বলেছেন, একদিন তেল মালিশ করার সময় আমার মনে হল মায়ের পায়ের বাত যদি আমার পায়ে আসে তো মা ভালো থাকেন, তবে খুব আনন্দ হবে। এই ভেবে মায়ের পায়ে হাত রেখে আমার ঐ হাতের কনুইটি আমার পায়ের হাঁটুতে ঠেকাতেই মা আমার দাড়িতে চুমো খেয়ে বললেন : 'ছিঃ ছিঃ, এসব কি ভাবছ? তোমরা বেঁচে থাক। ঠাকুরের কত কাজ করবে। আমি বুড়ি হয়েছি, আর কতকাল বাঁচব।'[১৫] সন্তানদের প্রতি মা যেন ছিলেন স্নেহের সাগর। তাঁর সন্তানস্নেহে কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল না। তিনি যে সকলের মা, তাই সকল সন্তানের প্রতি তিনি ছিলেন সমানভাবে যত্নশীল। গৌরীশ্বরানন্দ মহারাজ বলছেন : একদিন আমি খাবার জন্য শাল পাতায় একটু জল ছিটিয়ে ঝেড়ে পাতছি, এমন সময় মা বললেন : 'আহা! ছেলেরা খাবে, ভাল করে ধুয়ে নাও নইলে ধুলো থাকবে।[১৬]

আরও একটি ঘটনায় মহারাজ বলছেন : একদিন মায়ের বাক্সের সব কাপড় রোদে দিচ্ছি - একখানি ছেঁড়া আসাম সিল্কের এন্ডি বা মুগার কাপড় হবে - আমি ঠিক কিসের জানতাম না। কাপড়টি একটু ছেঁড়া দেখে বললাম : 'মা এই কাপড়টি ফেলে দিই, এটা ছিঁড়ে গেছে'। মা বললেন, 'না বাবা ফেল না, ওটি বড় আদর করে ''খুকী'' (নিবেদিতা) আমাকে দিয়েছিল। অনেকদিন পরেছি।'

একজন নারীর মধ্যে কি অসীম মাতৃত্ববোধ আর স্নেহ লুকিয়ে থাকে তার জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি শ্রী শ্রী মা সারদা দেবী। একাধারে তিনি নারীশক্তি রূপে বিরাজিতা, অপরদিকে তিনি মাতৃ-আদর্শ পরাকাষ্ঠা।

সারদাদেবীর একনিষ্ঠ সন্তানদের কথায় একটি বিষয় বারবার উঠে এসেছে যে, মা সর্বকালের সমস্ত সামাজিক প্রেক্ষাপটেই তাঁর দেবীসত্তা আর মানবীসত্তা - এই দুই বিপরীতমুখী ধারাকে শান্ত গতিতেই বহন করে চলেছেন। তাঁর স্নিগ্ধ অথচ অসীম শক্তির মহিমা দেশ-কালের গণ্ডি অতিক্রম করে যুগে যুগে নারী জাতি তথা তাঁর সমস্ত সন্তানদের জীবনে পথ দেখাবে। মায়ের ত্যাগী শিষ্য যাঁরা, সেইসব মহান ব্যক্তি ও মহিয়সীদের মা সম্পর্কে এই উপলব্ধি জানার পরেও কোথাও যেন সাধারণ মানুষের মনে প্রায়ই একটি প্রশ্ন উঁকি দেয় - পৃথিবী আজ অনেক এগিয়ে গেছে, আজ পুরোনো কুসংস্কারের বিনাশ করতেই তৎপর প্রগতিশীলেরা। কিন্তু আপাদমস্তক ধর্মভাবনায় আবৃতা, অন্তরালবর্তিনী মা সারদা কীভাবে একালের নারী জীবনের আদর্শ হতে পারেন? এই প্রশ্ন তুলে মায়ের জীবনাদর্শ ও অসীম শক্তির মহিমার সত্যতা বিচার করার দুঃসাহস আমার নেই। আসলে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মধ্যে দিয়ে আমি মায়ের জগৎ-জননী রূপকেই আর একবার স্মরণ করতে চেয়েছি। আমরা জানি, যে সভ্যতার প্রেক্ষাপটে শ্রী শ্রী মা তাঁর জীবন যাপন করেছেন সেখানে মেয়েদের অধিকারের তুলনায় অনেক বেশী ভাবা হত তাদের কর্তব্যের কথা। মা চেয়েছিলেন সমাজ কাঠামোর মধ্যে থেকেই প্রত্যেক মেয়ের আচরণে প্রকাশিত হোক ধৈর্য্য, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা। কিন্তু বর্তমান নারীসমাজের পরিবর্তিত মানসিকতায় রয়েছে বিশেষ অধিকারের দাবি, অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও পূর্ণ মানুষের স্বীকৃতির দাবি। নারী সমাজ মনে করতে শুরু করেছে, সমস্ত কর্মক্ষেত্রে, সমস্ত রকম প্রতিভা প্রকাশের ক্ষেত্রে পুরুষদের সমকক্ষ বা বলা যেতে পারে তাদের তুলনায় অনেক বেশী দক্ষ হওয়াতেই নারীদের সার্থকতা। তাহলে এযুগে নারীর এই আশা, আকাঙ্খা, আদর্শবোধ কি শ্রীমার জীবন আদর্শ দ্বারা পরিতৃপ্ত হবে?

আসলে সারদাদেবী কোনো বাণী বা বক্তৃতা কখনও সেভাবে প্রকাশ্য জনসমক্ষে দিয়ে যাননি। তাঁর জীবনই ছিল তাঁর বাণী। নিজেকে তিনি কখনও জাহির করতেন না। এমনকি সন্তানদের সমস্যাগুলি তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করলেও সরাসরি কোন সমাধানের পথ নির্দেশ করতেন না। তিনি ব্যক্তিকে এমন এক মানসিকতায় পৌঁছে দিতেন, যাতে সে নিজেই সমাধানের পথটি খুঁজে নিতে পারে। মা যেন নিঃশব্দেই এক বিপ্লবীর কাজ করে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে কেউ বিদেশী নয়, কেউ দূরের নয়, কারণ তিনি ''মা''। তিনি বলতেন : আমার ছেলে যদি ধুলো-কাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে।![১৭] দোষ তো সব মানুষেরই থাকে, কিন্তু তা নিয়ে সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক না করে বরং ক্ষমা আর বিশ্বাসের মন্ত্রে দোষীকে কীভাবে শুদ্ধ করে তুলতে হয়, মায়ের জীবনের বিভিন্ন ছত্রে তার দৃষ্টান্ত অসংখ্য।

আজকাল মেয়েরা আসলে কী চায়? সাধারণভাবে তাদের কাম্য কী? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই উঠে আসে প্রথাগত ভাবনা ও জীবনধারা থেকে মুক্তির কথা। নানা রকম আকর্ষণীয় ও কঠিন কাজ, সেটা ব্যবসা হোক বা বিজ্ঞান, সঙ্গীত হোক বা প্রযুক্তিবিদ্যা - সবক্ষেত্রেই তারা পুরুষদের সমান দক্ষতা ও স্বাধীনতা দাবি করে। কিন্তু বর্তমান সমাজের দিকে তাকালে দেখব কোথাও যেন এই দাবিগুলি ক্রমশ ক্রোধে পরিণত হয়ে উঠেছে। এই ক্রোধ 'পুরুষ অত্যাচারীদের' বিরুদ্ধে। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হল - সমাজ থেকে, পরিবার থেকে মেয়েরা ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। ফলে পারিবারিক সম্পর্কগুলি আজ অবলুপ্তির পথে।

আর তার ফলশ্রুতি হলো একাকিত্ব। যূথবদ্ধভাবে বসবাসের ফলে পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেন ও অন্তরঙ্গতার যে অস্তিত্ব এক সময় ছিল, তা প্রায় অবলুপ্ত বলা যেতে পারে। এর দরুণ কোথাও যেন এক হতাশা আর হীনমন্যতাবোধ গ্রাস করছে নারী সম্প্রদায়কে। সমাজে যারা কর্তৃত্ব করছে সেই পুরুষদের প্রতি ক্রোধ, নিজেদের প্রতিও ক্রোধ, কেননা তারা এই অবস্থা সহ্য করে যাচ্ছে। কিন্তু এর কারণ কি তাদের নিজেদের অযোগ্যতা নয়? মা আজ থাকলে এই সমস্যার কী সমাধান করতেন তা সঠিক বলতে পারি না। তবে তাঁর জীবনচর্যার যেটুকু উপলব্ধি করেছি তাতে মনে হয়েছে, তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে একথা বুঝতেন যে আজকের মেয়েদের সব সমস্যার মূলে আছে স্বাভাবিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব, নিজের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে সচেতনতার অভাব। আসলে সুখের অস্তিত্ব হৃদয়ে, সেই সুখকেই খুঁজতে হবে। মায়ের কাছে এটি আর কিছুই নয় - ঈশ্বরকে ভালোবাসা। আর যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকে তবে নিজের ভেতরে থাকা জ্ঞান ও প্রেমের শক্তি দিয়ে প্রত্যেককে গ্রহণ করতে, ভালোবাসতে হবে। কিন্তু আজ তো প্রকৃত ভালোবাসারই অভাব। ভালোবাসা দিয়ে গোটা সমাজকে বদলানো যায়। সেই ভালোবাসা ছিল শ্রীমা সারদাদেবীর মধ্যে। তাই তো তিনি জাতপাত, বর্ণবৈষম্যের উর্ধ্বে উঠে বলতে পেরেছিলেন, 'শরৎ যেমন আমার সন্তান, আমজাদও আমার সন্তান।'

বর্তমান জীবনে দাম্পত্য শুধুই শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই, আর স্বার্থত্যাগের অভাব। যার ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বেড়ে চলেছে সহস্র যোজন দূরত্ব। আর তার শিকার হচ্ছে শিশুরা। ফলে মেয়েরা না হতে পারছে আদর্শ স্ত্রী, না হতে পারে আদর্শ মা। এর সমাধানের জন্য প্রয়োজন স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দিক থেকেই সমান সহযোগিতা, আত্মশোধন। সারদাদেবীই যে শুধু শ্রীরামকৃষ্ণকে সহযোগিতা করে গিয়েছেন তাই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাঁকে যোগ্য সম্মান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : 'ও সারদা - সরস্বতী - জ্ঞান দিতে এসেছে।'[১৮] স্ত্রীর প্রতি এই শ্রদ্ধা আজকের যুগের পুরুষ জাতির কাছেও এক পরম উদাহরণ। স্ত্রী যে স্বামীর যথার্থ সহধর্মিণী, জীবনসঙ্গিনী সেকথাও রামকৃষ্ণদেব বুঝিয়ে ছিলেন মাকে কঠিন এক দায়িত্ব দিয়ে। বলেছিলেন : 'কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিল্‌বিল্‌ করছে। তুমি তাদের দেখো।'[১৯] ঐ প্রসঙ্গে আশাপূর্ণা দেবী একটি সুন্দর কথা বলেছেন : 'সাধক সন্ন্যাসী স্ত্রীকে 'মা' বলে 'ত্যাগ' করেছেন এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়, কিন্তু স্ত্রীকে 'মা' বলে গ্রহণ করেছেন এমন নজির ইতিহাসে আছে?'[২০]

সারদা দেবীর ব্যক্তিত্ব, আদর্শ, ত্যাগ, ক্ষমা, ধৈর্য আজ সারা পৃথিবীর মেয়েদের চলার পথে পাথেয় হওয়া উচিত। শ্রী শ্রী মায়ের দেহত্যাগের পর জোসেফিন ম্যাকলাউড স্বামী সারদানন্দকে লিখেছিলেন : 'সেই নির্ভীক, শান্ত, তেজস্বী জীবনের দীপটি তাহলে নির্বাপিত হল - আধুনিক হিন্দুনারীর কাছে রেখে গেল আগামী তিন হাজার বছরের নারীকে যে মহিমময় অবস্থায় উন্নীত হতে হবে, তারই আদর্শ।'[২১]

তথ্যসূত্র

১। গম্ভীরানন্দ, স্বামী; *শ্রীমা সারদা দেবী*, ষষ্ঠ সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৪৮, পৃষ্ঠা. ১২৭।

২। শ্রী শ্রী মা সারদা শতবর্ষ-জয়ন্তী

৩। গম্ভীরানন্দ, স্বামী; *শ্রীমা সারদা দেবী*, ষষ্ঠ সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৪৮, পৃষ্ঠা. ১২৭।

৪। গম্ভীরানন্দ, স্বামী; *শ্রীমা সারদা দেবী*, ষষ্ঠ সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৪৮, পৃষ্ঠা. ১২৮।

৫। তদেব, পৃষ্ঠা. ৯১।

৬। তদেব, পৃষ্ঠা. ৭৩-৭৪।

৭। বিবেকানন্দ, স্বামী; *বাণী ও রচনা*, ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৮৩, পৃষ্ঠা. ৩০৯।

৮। বিবেকানন্দ, স্বামী; *বাণী ও রচনা*, সপ্তম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৮৩, পৃষ্ঠা. ৭৬-৭৭।

৯। Narasikmhananda, Swami; *Prabuddha Bharat,* VOL. LVII, Advaita Ashrama, Kolkata, 1952, P. 410.

১০। বিবেকানন্দ, স্বামী; *বাণী ও রচনা*, সপ্তম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৮৩, পৃষ্ঠা. ৭৬।

১১। *Letters of Sister Nibedita;* Sankariprasad Basu (ed.), Nababharat Publishers, Kolkata, 1982, p. 505.

১২। Ibid, p. 631.

১৩। বসু, শঙ্করীপ্রসাদ; *নিবেদিতা লোকমাতা*, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৭৫, পৃষ্ঠা. ১৯১।

১৪। *শতরূপে সারদা;* স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সম্পাদনা), রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা. ২৮০।

১৫। তদেব, পৃষ্ঠা. ২৮১।

১৬। তদেব, পৃষ্ঠা. ২৮৯।

১৭। গম্ভীরানন্দ, স্বামী; *শ্রীমা সারদা দেবী*, ষষ্ঠ সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৪৮, পৃষ্ঠা. ২৩৮।

১৮। তদেব, পৃষ্ঠা. ৪০৩।

১৯। তদেব, পৃষ্ঠা. ১৩৪।

২০। *শতরূপে সারদা;* স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সম্পাদনা), রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা. ৪৪৮।

২১। উদ্বোধন; স্বামী সত্যব্রতানন্দ (সম্পাদক), উদ্বোধন কার্যালয়, ১৭ বর্ষ, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা. ৩৪।

গ্রন্থপঞ্জী

১। গম্ভীরানন্দ, স্বামী; *শ্রীমা সারদা দেবী*, ষষ্ঠ সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৪৮।

২। *শতরূপে সারদা;* স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সম্পাদনা), রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ১৯৮৫।

৩। দেবী দুর্গাপুরী; *সারদা-রামকৃষ্ণ*, শ্রী শ্রী সারদাদেবীর আশ্রম, কলকাতা ১৩৬৮।

৪। বসু, শঙ্করীপ্রসাদ; *নিবেদিতা লোকমাতা*, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৭৫।

৫। বিবেকানন্দ, স্বামী; *বাণী ও রচনা*, সপ্তম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৬৭, পৃষ্ঠা. ৭৬।